ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
নবম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১১/নভেম্বর ২০০৪

চা শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

মোঃ ইসমাইল হোসেন*

Abstract: *Tea is one of the main cash crops in Bangladesh. It earns a lot of foreign currency by exporting to other countries. Tea industry in Bangladesh provides a year round employment for about four lacks people amonst them mostly are women and equal number depend on tea related anciliary avtivities for their livelihood. From dawn to dusk, they work hard and contribute a great deal for yielding this crop. But the misery is that the socio-economic conditions of woman tea workers are very poor and they maintain a very low living standard. Some studies reveal that they pass their daily lives in a very detrimental condition. From the present study an initiative has been taken to unfold their socio-economic conditions, employment pattern and working conditions, benefits and problems. In the last section, the author has proposed some suggestions to mitigate their sufferings.*

ভূমিকা

বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় এ দেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদিত কৃষি পণ্যগুলোর মধ্যে চা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আসে চা রপ্তানীর মাধ্যমে। ভৌগলিক ও আবহাওয়াগত কারণে এ দেশের চা বাগানগুলো পাহাড়ী এলাকাগুলোতে গড়ে উঠেছে। যার কারণে এ সকল চা বাগান আধুনিক লোকালয় হতে অনেক দূরে, যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত নয়। বাইরের জগতের সাথে তাদের খুব একটা যোগাযোগ নেই। যুগযুগ ধরে তারা এখানেই বসবাস করছে। অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ও দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্যহীনতা ইত্যাদি চা বাগানগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। উন্নয়নের মূলস্রোতধারা থেকে তারা বঞ্চিত। চা বাগান এলাকাগুলো যেন দেশের মধ্যে অন্য এক জগত, যে জগতের লোকেরা জানে না অন্য জগতে কি ঘটছে। বংশানুক্রমিকভাবে তারা চা শিল্পের সাথে জড়িত হয়ে থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সাথে সাথে এই শিল্প অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের এক বিশাল ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ১.৫ লক্ষ শ্রমিক চা শিল্প থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে এবং চা শিল্পের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। বাংলাদেশ চা বোর্ডের ২০০৪ সালের তথ্যানুযায়ী চা বাগানের মোট জনসংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১ লক্ষ ৮২ হাজার ২৮৪ জন এবং মহিলা ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮০১ জন।

* *সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট*

শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ খুব বেশি দিনের নয়। গত দুই দশক ধরে শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। জনশক্তি জরিপ ১৯৯৫-৯৬ (Labour Force Survey) অনুযায়ী ১০ বৎসরোর্ধ্ব নারীদের মধ্যে মাত্র ১৮.১ শতাংশ নারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত আছে। যেখানে পুরুষের মধ্যে এই সংখ্যা ৭৭ শতাংশ। ১৯৯৯-০০ অর্থ বছরের বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) অনুযায়ী ৬.০৩ কোটি শ্রমশক্তি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ৩.৭৫ কোটি এবং মহিলা ২.২৮ কোটি। কৃষিতে এখনও সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত (৬২.৩%)। তবে চা শিল্পে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি এবং ক্রমান্বয়ে এ সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমানে প্রায় ৬০ শতাংশেরও বেশি নারী শ্রমিক এই শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে।

সারণি-১: চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের কাঠামো

শ্রমিকের ধরন	কর্ম-প্রকৃতি অনুযায়ী মোট শ্রমিক		মোট শ্রমিক
	স্থায়ী শ্রমিক	অস্থায়ী/ঠিকা শ্রমিক	
পুরুষ	৩৯,৬৪৭	১৯৫৯২	১০৯৪০৪
মহিলা	৩৯,৩৩১		
কিশোর/ কিশোরী	১০,৮৩৪		
মোট	৮৯৮১২	১৯৫৯২	১০৯৪০৪

Source: PDU, BTB, Srimanghal, Moulvibazar, 2004.

সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকে। কিন্তু এর বিনিময়ে তারা অতি সামান্যই পেয়ে থাকে। বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন দলিলে শ্রম শক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকে পরিবার তথা দেশের ব্যাপক দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টির উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু চা বাগানগুলোতে সে পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করা আজও সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তার তেমন কোন কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায় না। যেমন: বঙ্গীয় মাতৃত্বকল্যাণ (চা বাগান আইন) ১৯৫০, চা উৎপাদন শ্রমিক রুলস ১৯৭৭। এ সকল আইন কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ আছে। অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাবে আইনগত এ অধিকার সম্পর্কেও তারা সচেতন নয়।

বাংলাদেশের চা শিল্প : অতীত ও বর্তমান

চা সারা বিশ্বে একটি জনপ্রিয় পানীয়। এ কারণে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনের সমন্বিত পণ্য কর্মসূচিতে (Integrated Programme for Commodities)

যে দশটি প্রধান পণ্য (Core Commodities) স্থান পায় তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো চা (Sana, 1989)। এই গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় পণ্য উৎপাদনে (আয়তন ও বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ বিচারে) বিশ্বের ৩০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান নবম। আর শুধুমাত্র বার্ষিক উৎপাদনের নিরিখে বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ (ITC, 1996)।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতেও চা শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। একদিকে চা শিল্প এদেশের ক্রমবর্ধমান বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে উৎপাদিত চা রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৩-০৪ আর্থিক বছরে বার্ষিক চা উৎপাদনের পরিমাণ ৫৫.৪৬ হাজার মেট্রিক টন যা ২০০১-০২ সনে ছিল ৫৫.৯২ এবং ১৯৯৫-৯৬ সনে ছিল ৬১ হাজার মেট্রিক টন (BTB, 2004)।

সারণি-২: চা শিল্প হতে আয় (মার্কিন ডলার)

আর্থিক বছর	সর্বমোট রপ্তানী আয়	চা হতে রপ্তানী আয়	রপ্তানী আয়ে চা শিল্পের অংশ
১৯৯৫-৯৬	৩৮৮৪	৩৩	০.৮২
২০০০-০১	৬৪৬৭	২২	০.৩৪
২০০১-০২	৫৯৮৬	১৭	০.২৪
২০০২-০৩	৬৫৪৮	১৫	০.২২
২০০৩-০৪	৫০৪০	১৪	০.২৭

Source : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৪, পৃ-২৪২।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ১৮৩৪ সালে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চীনের সাথে একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে। এই সময়ে ইংরেজরা চা চাষে এগিয়ে আসে এবং বৃটিশ শাসিত বিভিন্ন জায়গায় চীনা বীজ দিয়ে চা চাষ আরম্ভ করে (ইসলাম ও হোসেন, ১৯৯৪)। চা শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশে বাংলাদেশ ও ভারত একই সূত্রে গাঁথা। ১৮১৯ সালে আসাম গভর্ণরের এজেন্ট ডেভিড স্কটের উপর চা চাষের ভার দেয়া হয়। পরে স্কট ভ্রাতৃদ্বয় ১৮২৩ সালে আসামের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে সদিবার আশেপাশে বন্য চা গাছ আবিষ্কার করেন। তখন থেকেই বাংলাদেশসহ এই উপমহাদেশে আসাম ও চীনা জাতের চায়ের আবাদ শুরু হয়।

বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান মালনিছড়া প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৪ সালে। আর এই বাগানে চা উৎপাদনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে চা শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই পর্যায়ক্রমে চা শিল্পের সম্প্রসারণ করা হয়। ধীরে ধীরে সিলেট ও চট্রগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে চা চাষ শুরু হয় (মোজাহার আলী, ১৯৮৬)। এ সকল বাগান বৃটিশদের অধীনেই

পরিবর্ধিত হয়, তারাই এগুলো পরিচালনা করতে থাকে। বৃটিশদের মধ্যে জেমস ফিনলে ছিলেন চা আবাদ ও বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য।

বর্তমানে দেশের ১৬০ টি চা বাগানের মধ্যে ৪টি (মৌলভীবাজারের নিরালা, লক্ষ্মীপুর, সিলেটের ডোনা এবং চট্টগ্রামের ইসলাম) চা বাগান পরিত্যক্ত রয়েছে। অর্থাৎ ১৫৬ টি বাগানে বাণিজ্যিকভিত্তিতে চা উৎপাদন চালু আছে (PDU, BTB, 2004)। ভৌগলিক ও আবহাওয়াগত কারণে এদেশের প্রধান চা বাগানগুলো পাহাড়ী এলাকায় গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের ৪ টি পাহাড়ী অঞ্চল–সিলেট, মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ ও চট্টগ্রামে মূলতঃ চা বাগানগুলো গড়ে উঠেছে। সিলেট অঞ্চলের লৌহ মিশ্রিত দোআঁশ মাটি ও আবহাওয়া চা চাষের জন্য বেশ উপযোগী। এ কারণে দেশের ১৬০ টি চা বাগানের মধ্যে ১৩৫ টি এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। চা উৎপাদনে শীর্ষে থাকার কারণে বৃহত্তর সিলেট জেলাকে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়ও কিছু চা বাগান গড়ে উঠেছে। পঞ্চগড় ও ময়মনসিংহে ক্ষুদ্রায়তনে চা চাষ হয়। বর্তমানে পঞ্চগড় জেলায় ০৬ টি চা বাগানে চা চাষ হচ্ছে।

সারণি- ৩ : ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী চা বাগানগুলোর বিন্যাস

ব্যবস্থাপনার ধরন	চা বাগানের সংখ্যা
ক. স্টার্লিং কোম্পানি ১) জেমস ফিনলে - ০৭ টি ২) ডানকান ব্রাদার্স - ১৫ টি ৩) ডিউন্ডি কোম্পানি - ০৪ টি ৪) সিলেট টি এস্টেট - ০১ টি	২৭
খ. বাংলাদেশী মালিকানাধীন ১) বাংলাদেশ টি বোর্ড - ৩টি ২) ন্যাশনাল টি কোম্পানী - ১৩ টি ৩) মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানী - ৫৭ টি ৪) ব্যক্তি মালিকানাধীন - ৬০ টি	১৩৩
সর্বমোট চা বাগানের সংখ্যা (ক+খ)	১৬০

Source: PDV , BTB, Srimangal, Sylhet.

সারণি-৪: চা বাগানগুলোর জেলা ও ভ্যালিভিত্তিক বিন্যাস

জেলাভিত্তিক বিন্যাস (সংখ্যা)		ভ্যালিভিত্তিক বিন্যাস (সংখ্যা)	
মৌলভীবাজার	৯২	বালিশ্বর	২৮
হবিগঞ্জ	২৩	লংলা	৩০
সিলেট	২০	লস্কর পুর	১৯
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১	মনুডলই	১৪
চট্টগ্রাম	২৩	নর্থ সিলেট	১৭
রাঙ্গামাটি	০১	জুরি	২৮
		চিটাগং	২৪
সর্বমোট	১৬০	সর্বমোট	১৬০

Source: PDV , BTB, Srimangal , Moulvibazar, 2004.

[বালিশ্বর: মৌলভীবাজার জেলার ২৩টি এবং হবিগঞ্জ জেলার ৫ টি বাগানের সমন্বয়ে গঠিত । লস্করপুর : হবিগঞ্জ জেলার ১৯ টি বাগানের সমন্বয়ে গঠিত । মনুডলই : মৌলভী বাজার জেলার (কমলগঞ্জ থানা) ১৪ টি বাগান । লংলা : মৌলভীবাজার (কুলাউড়া, রাজনগর) জেলার ২৭ টি ও সিলেট (ফেঞ্চুগঞ্জ) জেলার ৩ টি বাগানের সমন্বয়ে গঠিত । জুরি: মৌলভীবাজার জেলার (কুলাউড়া, বড়লেখা) ২৮ টি বাগানের সমন্বয়ে গঠিত। নর্থ সিলেট : সিলেট জেলার (সদর, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট) ১৭ টি বাগানের সমন্বয়ে গঠিত এবং চিটাগং : চট্টগ্রাম জেলার ২৩ টি ও রাঙ্গামাটি জেলার ১টি বাগানের সমন্বয়ে গঠিত ।]

বাংলাদেশের চা শিল্প থেকে যে উৎপাদন ও আয় হয় তার সিংহভাগ কৃতিত্বের দাবিদার চা শ্রমিকরা। কারণ তাদের শ্রমের বিনিময়েই বাংলাদেশের চা শিল্প টিকে আছে। একটা দেশের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে জমির উৎপাদনশীলতা, চা পাতা সংগ্রহ (Tea Plucking), প্রক্রিয়াজাতকরণ (Tea processing), ইনপুট সরবরাহ (Input supply) ইত্যাদির উপর। এ-গুলোর মধ্যে চা পাতা সংগ্রহ (Tea Plucking) বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই চা পাতা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের ৯০ শতাংশই নারী।

সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা

চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জীবনযাপন প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণা পরিচালিত হলেও চা শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের উপর তেমন কোন গবেষণা কার্য পরিচালিত হয়নি। নিম্নে কয়েকটি গবেষণা পর্যালোচনা করে বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো :

ILO-এর অর্থায়নে Paul Majumder (2001), সম্পাদিত গবেষণায় চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, Declaration on fundamental principles and rights at work-এ ঘোষিত দশটি ইস্যুর ভিত্তিতে চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা decent work কতটা অর্জন করতে পেরেছে তার বিশ্লেষণ, চা শিল্পের উন্নয়নে শিল্প মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন।

Saha (2001) তাঁর গবেষণায় চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পরিবারের আকার, শিক্ষাগত অবস্থা, বাসগৃহের ধরন, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, শিশুদের টিকাদান, মাদক সেবনের অভ্যাস, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য তুলে ধরেছেন।

আলম ও সুলতানা (২০০৪) সম্পাদিত গবেষণায় চা শিল্পে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তাদের কর্মপ্রকৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন, মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদি, কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

ক্ষুদ্র পরিসরে পরিচালিত এ সকল গবেষণায় চা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক বিষয় তুলে ধরা হলেও চা শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন বিষয়ে আলোকপাত করা হয় নি। অথচ চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিরাট একটা অংশ হচ্ছে নারী। কর্মক্ষেত্রে এ সকল নারী মজুরী-বঞ্চনাসহ নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকে। এ সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য নারী শ্রমিকদের নিয়ে আলাদাভাবে গবেষণা পরিচালনা করা জরুরী।

গবেষণার যৌক্তিকতা

চা শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই নাজুক। আধুনিক লোকালয়ের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে তাদের জীবনযাপনরীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের কোন সম্পৃক্ততা নেই। তারা অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে। বাগানের বাইরের পরিবেশের সাথে তাদের কোন যোগাযোগ নেই বললেই চলে। এ কারণে বাইরের পরিবেশের প্রভাব তাদের জীবনাচরণে তেমন কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। যুগ যুগ ধরে ভিন্ন পরিবেশে অবস্থানের কারণে নিজস্ব পরিমণ্ডলে তারা আলাদা একটা সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা চা শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছে। অথচ তাদের নিয়ে কেউ ভাবে না। একটা বিশাল জনগোষ্ঠী এই শিল্পের সাথে জড়িত থাকলেও চা বাগান এলাকাগুলো সরাসরি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের আওতা বহির্ভূত। বাগান কর্তৃপক্ষই এ এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে উন্নয়নের ছোঁয়া তারা

পায়নি। এই জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিকভাবে বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে। দারিদ্র্য, অপুষ্টি, মাদকাসক্তি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এসকল সমস্যার মারাত্মক পরিণতির শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকার কারণে পারিবারিক দায়িত্বাবলী সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। ফলে শিশুদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। শিশু স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ বংশধর রক্ষার জন্য নারী শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করা অপরিহার্য হলেও চা বাগানে কর্মরত এ সকল নারী শ্রমিকরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। চা শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের জীবনমান ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা ছাড়া চা শিল্পে উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় তেমনি দেশীয় মানব সম্পদের বিকাশ হবে সুদূর পরাহত।

চা শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চা শ্রমিক তথা চা শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এসকল কারণে চা শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান, শিক্ষাগত অবস্থা, স্বাস্থ্য, কর্ম পরিবেশ এবং প্রাপ্ত সুবিধাদি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। আলোচ্য গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলী এ উদ্দেশ্য অর্জনে অনেকখানি সহায়ক হবে বলে আশা রাখি।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো চা বাগানে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা। এ লক্ষ্যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে:-

১. চা শ্রমিকদের আর্থ-জনমিতিক তথ্য জানা।
২. চা বাগানে কর্মরত নারী শ্রমিকদের কর্ম ও কর্ম-পরিবেশ সম্পর্কে জানা।
৩. নারী শ্রমিকদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধাদি সম্পর্কে জানা
৪. নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ তুলে ধরা এবং
৫. নারী শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে সুপারিশ পেশ করা।

গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের উৎস ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণায় সিলেট শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত চা বাগানগুলোর মধ্য হতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ৫ টি চা বাগানে কর্মরত ১৫ বছরের ঊর্ধ্ব বয়সী ১০০ জন নারী শ্রমিকদের কাছ থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি চা বাগানে কর্মরত নারী শ্রমিকদের সংগে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, পর্যবেক্ষণ, মাঠ পরিদর্শন, কমিউনিটি মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমেও তথ্য নেয়া হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ ও সারণীবদ্ধ করে সাধারণ পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণাকালে বিভিন্ন Secondary উৎসেরও সাহায্য নেয়া হয়েছে।

সারণি-৫ : মালিকানা অনুযায়ী গবেষণাভুক্ত ৫টি চা বাগানের বিন্যাস

বাগানের নাম	মালিকানা	মোট জমি	চা এলাকা (হেক্টর)	উৎপাদন (কেজি)
মালনিছড়া	সিলেট টি কোম্পানী লিঃ	১০০৮.৫২	৫২০.৫৯	৬৫৭২৫০
লাক্কাতুরা	ন্যাশনাল টি কোম্পানী	১২৯৩.৩০	৫৯৯.৮১	৩১৫০০২
স্টার	ব্যক্তি মালিকানাধীন	১৩১.৬৫	৬৯.১২	৬৩১০০
আলীবাহার	আলী বাহার এন্ড কোম্পানী লিঃ	২৮৪.৪২	১৬৪.৫০	১০১৬৩৩
খাদিম	নিনা আফজাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	১৪৯১.০০	৬১৪.৮০	৫২৪৫০১

Source : PDU, BTB, Srimangal, Moulvibazar, 2004.

গবেষণার ফলাফল

১.আর্থ-জনমিতিক অবস্থা

চা বাগান এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীরা উত্তরাধিকার সূত্রেই এই পেশায় নিয়োজিত হয়ে থাকে। শিশু বয়স থেকেই মা বাবার হাত ধরেই চা বাগানে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে এই শিল্পেই নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করে। এ জন্য চা বাগানগুলোতে শিশু বয়সী থেকে শুরু করে প্রায় সকল বয়সী শ্রমিকের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ১০-১৫ বছর বয়সের মধ্যেই নারীরা চা বাগানের কাজ করতে আসে এবং একজন নারী শ্রমিক ৫০-৫২ বছর পর্যন্ত চা বাগানে কাজ করতে পারে। তবে গবেষণায় দেখা যায়, ৩৫ শতাংশ ২০-৩০ বছর বয়সী, ৩০ শতাংশ ৩০-৪০ বছর বয়সী এবং ২১ শতাংশ ৪০-৫০ বছর বয়সী। ৫০ বছর বয়সোর্ধ্ব মাত্র ৪ শতাংশ (সারণি-৬)। অর্থাৎ বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ হলো যারা বেশি শ্রম বিনিয়োগ করতে পারে তাদেরকেই বাগানে নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

সারণি-৬ : নারী শ্রমিকদের বয়স কাঠামো

বয়স (বছর)	গণসংখ্যা	শতকরা
১০-২০	১০	১০
২০-৩০	৩৫	৩৫
৩০-৪০	৩০	৩০
৪০-৫০	২১	২১
৫০-৬০	০৪	০৪
মোট	১০০	১০০

চা শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এরা মূলতঃ নিম্নবর্ণের হিন্দু। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ৭৬ শতাংশ নারী শ্রমিকের ধর্ম হিন্দু। ১৬ শতাংশ নারী

শ্রমিকের ধর্ম হচ্ছে খ্রীস্টান । ইসলাম ধর্ম অনুসারী শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম অর্থাৎ মাত্র ৭ শতাংশ। তবে হিন্দু ধর্মাবলম্বী শ্রমিকরা সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। সনাতন হিন্দু ধর্ম পালনকারীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি রয়েছে। যেমন: মাদ্রাজী, উড়িয়া, মুন্দা, বিহারী, বাউরী, সাঁওতাল, গোয়ালা, নেপালী, সবর মাহানী ইত্যাদি। এ সকল নারী শ্রমিকদের ৯১ শতাংশ বিবাহিত, ৬ শতাংশ বিধবা এবং ৩ শতাংশ তালাক প্রাপ্তা (সারণি-৭)। গবেষণা নমুনায় কোন অবিবাহিত নারী শ্রমিকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এর অন্যতম কারণ হলো চা বাগান এলাকাগুলোতে অতি অল্প বয়সেই বিবাহ সম্পাদিত হয়ে থাকে (সারণি-৮)। গবেষণায় দেখা যায় ৪৪ শতাংশ নারীর বিয়ে সম্পাদিত হয়েছে ১০-১৫ বছর বয়সের মধ্যে এবং ৩৫ শতাংশ নারীর বিয়ে হয়েছে ১৫- ১৭ বছর বয়সের মধ্যে। উত্তরদাতাদের বিবাহের গড় বয়স ১৫.৯৬ বছর। ১৯৮৫ সালের মুসলিম পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ মোতাবেক বিবাহের ন্যূনতম বয়স (মহিলা) ১৮ বছর করা হলেও অধিকাংশ নারী এ বিষয়ে অবগত নয়। নারী পুরুষ বৈষম্য রোধ, নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার ও নারী উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার তার ক্ষমতায়ন। নারীর আইনগত ক্ষমতায়নের সাথে নারীর বিবাহ নিবন্ধীকরণের একটা ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। নারীর বিবাহ নিবন্ধীকরণ তার ক্ষমতায়নের কৌশলস্বরূপ। কিন্তু গবেষণা এলাকায় কর্মরত নারীরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে এখানে কোন বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা হয় না। এর কারণ হচ্ছে এ সকল আইন সম্পর্কে তারা সচেতন নয়। শুধু বিয়ে সংক্রান্ত নয়, নারীর নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক যে সকল আইন রয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও তারা একেবারেই অজ্ঞ।

সারণি-৭: চা শ্রমিকদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	গণসংখ্যা	শতকরা
বিবাহিত	৯১	৯১
অবিবাহিত	০০	০০
তালাকপ্রাপ্তা	০৩	০৩
বিধবা	০৬	০৬

সারণি-৮: নারী শ্রমিকদের প্রথম বিবাহকালীন বয়স

প্রথম বিবাহকালীন বয়স	গণসংখ্যা	শতকরা
১০- ১৪ বছর	৪৪	৪৪
১৫-১৭ বছর	৩৫	৩৫
১৮ বছরের উর্ধ্বে	২১	২১
মোট	১০০	১০০

প্রথম বিবাহকালীন গড় বয়স = ১৫.৯৬ বছর ।

চা বাগান এলাকার বেশিরভাগ শ্রমিক একক পরিবারে বসবাস করে থাকে। ফলে একজন নারী শ্রমিক তার স্বামী এবং সন্তান সন্ততি নিয়ে বসবাস করে থাকে। কোন সন্তান বিয়ে করলে সে পরিবার থেকে আলাদা হয়ে পৃথক পরিবার গঠন করে। কিন্তু চা বাগান এলাকায় একক পরিবারের সংখ্যা বেশি হলেও চা শ্রমিকদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি। ৭০ শতাংশ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪-৬ জন, ১৭ শতাংশ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১ থেকে ৩ জন এবং ১৩ শতাংশ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ থেকে ১০ জনের মধ্যে (সারণি-৯)। অর্থাৎ ৭০ শতাংশ নারী শ্রমিকের ৩ থেকে ৪ জন সন্তান রয়েছে এবং ১৩ শতাংশ শ্রমিকের ৫-৭ জন সন্তান রয়েছে। অধিক সন্তান জন্ম দানের কারণে অধিকাংশ নারী শ্রমিক ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের তেমন কোন জ্ঞান নেই। এ বিষয়ে নারীদেরকে সচেতন করে তোলার জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকর্মী থাকলেও বাগান এলাকাতে তাদের দেখা যায়নি।

সারণি-৯: চা শ্রমিকদের পরিবারের আকৃতি

সদস্য সংখ্যা	গণসংখ্যা	শতকরা
০১-০৩ জন	১৭	১৭
০৪-০৬ জন	৭০	৭০
০৭-১০ জন	১৩	১৩
মোট	১০০	১০০

২. শিক্ষা ও সচেতনতা

একজন সুস্থ ও শিক্ষিত শ্রমিক একজন অসুস্থ ও অশিক্ষিত শ্রমিকের তুলনায় অধিক দক্ষ এবং উৎপাদনশীল হয়। তাই আই.এল.ও কনভেনশন অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য এই দুটি সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরী। কিন্তু চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকেরা এ সুবিধা অর্জন করতে পারে নি। গবেষণায় দেখা যায়, ৩০ শতাংশ নারী নিরক্ষর এবং ১৮ শতাংশ শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষর করতে পারে। ৬২ শতাংশ নারী লেখাপড়া জানলেও কেউ প্রাথমিক স্তর শেষ করে মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। শিশু বয়স থেকেই মা-বাবার হাত ধরে চা বাগানের কাজে নিয়োজিত হয়ে থাকে। অধিকাংশ নারী শ্রমিকের ধারণা হলো বড় হয়ে অন্য কোন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ নেই, চা বাগানেই তাদেরকে কাজ করতে হবে। এজন্য ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ নেই। এ ধরনের মনমানসিকতার কারণে বংশ পরম্পরায় তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

চা উৎপাদন শ্রমিক রুলস'১৯৭৭-এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, প্রতিটি বাগানে লেবার লাইনের ১ মাইলের মধ্যে বাগান কর্তৃপক্ষ স্কুল স্থাপন করবেন এবং দক্ষ শিক্ষক

নিয়োগ করবেন। কিন্তু কার্যতঃ চা বাগানগুলোতে তা প্রতিফলিত হয়নি। গবেষণাভুক্ত চা বাগানগুলোর একটিতেও বাগান কর্তৃপক্ষ পরিচালিত কোন স্কুল পাওয়া যায়নি। দুটি বাগানে ব্র্যাক পরিচালিত দুটি স্কুল আছে। ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলে ৩০ জন ছাত্রের একটি ব্যাচ থাকে এবং ঐ ব্যাচটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোন ছাত্র ভর্তি করে না। ফলে খুব কম সংখ্যক শিশু এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে। বাগান এলাকায় স্কুল স্থাপনের দায়িত্ব বাগান কর্তৃপক্ষের হওয়ায় বাগানের চৌহদ্দির মধ্যে কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও নেই। জানা গেছে, দেশের ১৫৮ টি চা বাগানে বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫৯৬৬ জন (BTB,2002)। এ তালিকাভুক্ত শিশুদের অনেকেই বিদ্যালয়ে যায় না বা লেখাপড়ার সাথে জড়িত নেই। প্রাথমিক শিক্ষার ঊর্ধ্বে শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগই তাদের নেই। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মাধ্যমিক স্কুলে যেতে চাইলে বাগানের বাইরে অবস্থিত কোন স্কুলে যেতে হবে যা বাগান থেকে অনেক দূরে। বাগান এলাকায় যানবাহনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় পায়ে হেঁটে দূরের কোন স্কুলে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। শিক্ষা সুযোগের অভাব ছাড়াও বিদ্যমান দারিদ্র্যও চা শ্রমিকদেরকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সংসারের আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য শিশু সন্তানকে স্কুলে না পাঠিয়ে কর্মে নিয়োগ করা হয়। কর্মকালীন কর্মজীবী নারীদের সন্তানদের রাখার জন্য শিশুগৃহের (Creche) ব্যবস্থা রাখার কথা থাকলেও এ বাগানগুলোতে তার কোন অস্তিত্ব নেই। ফলে স্কুল গমনোপযোগী শিশুদেরকেই তাদের ছোট ভাইবোনকে দেখাশোনা করতে হয়। এ সকল কারণে তারা স্কুলে যেতে পারে না। এজন্য বাগান এলাকায় পঞ্চম শ্রেণীর ঊর্ধ্বে লেখাপড়া জানা কোন নারী শ্রমিকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। এভাবে যুগ যুগ ধরে তারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং নিরক্ষর থেকে যাচ্ছে। শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ নারী শ্রমিক সামাজিকভাবে খুবই অসচেতন। খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য, সন্তান ধারণ ও লালন পালন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানের অভাবে পুষ্টিহীনতা, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, অধিক সন্তান জন্মদান ইত্যাদি চা বাগানগুলোর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

৩. নিরাপদ আবাসন, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

চা উৎপাদন শ্রমিক রুলস অনুযায়ী চা বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ফ্রি আবাসিক সুবিধা প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে চা শ্রমিকদের জন্য বাগানের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় আবাসিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, যেটি লেবার লাইন হিসেবে পরিচিত। একটি লেবার লাইনে অনেকগুলি পরিবার একত্রে বসবাস করে থাকে। ফলে এলাকাটিতে ঘিঞ্জি পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এখানকার পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা মোটেও ভাল নয়। আবাসিক এলাকায় একটি পরিবারের জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ থাকে। অথচ চা শ্রমিকদের পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫ থেকে ৬ জন। এই ৫/৬ জন সদস্যকে একই কক্ষে বসবাস করতে হয়। অন্যদিকে বাগান কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র আবাসনের ব্যবস্থা করেই খালাস। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তারা গ্রহণ করে না। তাই দেখা গিয়েছে লেবার লাইনগুলোতে যেসব ঘরবাড়ী রয়েছে তা অত্যন্ত দীর্ণ ও

জরাজীর্ণ। এ অবস্থায় চা শ্রমিকরা ভাঙ্গাচোরা বাড়ীতে কোন রকমে দিনাতিপাত করছে। বর্ষা মৌসুমে টিনের চালের ফুটো দিয়ে গৃহে পানি প্রবেশ করে এবং ঘরের মেঝে পানিতে থৈ থৈ করে। ফলে এই মৌসুমে অনেক রাত তাদের বিনিদ্র কাটে। ঘর হতে বাগানে যাওয়ার রাস্তাও কর্দমাক্ত থাকে। চা শ্রমিকেরা এসব কাদামাটির মধ্য দিয়ে খালি পায়ে চলাফেরা করে। যার ফলে হুক-ওয়ার্মে আক্রান্ত হওয়া তাদের জন্য একটি সাধারণ ঘটনা।

সুন্দর ও সুস্থ জীবন যাপনের একটি অন্যতম মাধ্যম হলো নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি এবং পয়ঃনিস্কাশন সুবিধা ভোগের অধিকার থাকা। ১৯৭৭ সালের চা শ্রমিক রুলস অনুযায়ী চা শ্রমিকদের বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন সুবিধা পাওয়ার কথা থাকলেও তারা এ সুবিধা প্রাপ্তি থেকে অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয়। নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের এক তথ্যে দেখা যায়, শ্রমিকদের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ৩২৯৫ টি হস্তচালিত নলকুপ, ৪৮৩১টি কুয়া (Dug well) এবং ৯১টি গভীর নলকূপ স্থাপন করেছে (BTB, 2004)। কিন্তু সবগুলো কুয়ার উপর ঢাকনা নেই। কোন কোন নলকুপ ইতিমধ্যে অকেজো হয়ে পড়েছে, অথচ মেরামতের কোন উদ্যোগ নেই। ফলে দূর দূরান্ত থেকে তাদের পানি আনতে হয়। আর একাজটি নারীরাই করে থাকে (পাল মজুমদার ও সরকার, ১৪০৬)।

পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলো এখন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে আছে। তাছাড়া ল্যাট্রিনগুলো নির্মাণ করা হয়েছে রান্না ঘর বা পুজা ঘরের সংলগ্ন । ফলে এগুলো তারা ব্যবহার করে না। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে তারা টয়লেট ব্যবহার না করে বাগান এলাকায় খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে থাকে যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে টয়লেটগুলো জ্বালানী রাখার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৪. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা

অধিক উৎপাদনশীলতা (Higher Productivity) নিশ্চিত করতে হলে শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা অপরিহার্য হলেও চা শ্রমিকদের সে অধিকার নিশ্চিত হয় নি। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাবে চা বাগানে কর্মরত নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা খুবই দুর্বল। তাদের মধ্যে রোগ প্রবণতা ব্যাপক। কারণ বছরের ১২ মাসই তাদেরকে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করতে হয়। আর পাতা উত্তোলনের কাজটি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই করতে হয়। তাছাড়া বাগানে ব্যবহৃত বিভিন্ন কীটনাশক ঔষধ এবং রাসায়নিক সারও শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ সমস্ত কারণে চা শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের শ্বাসপ্রশ্বাস (Respiratary) ও পানি বাহিত (Water borne) রোগ ব্যাধিতে ভুগে থাকে। ম্যালেরিয়া, সর্দিজ্বর, ডায়রিয়া, আমাশয়, পেট ব্যথা, শারীরিক দুর্বলতা, কৃমি, চোখ ব্যাথা, মূত্রপ্রদাহ, মাথা ব্যথা, চুলকানিসহ বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়াও রক্তস্বল্পতা, গ্যাস্ট্রিক, বুক ব্যথা এবং যক্ষার মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগেও তারা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হয়ে থাকে (Paul-Majumder, 2001)।

তাদের এ ধরনের অসুস্থতা চা উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন (disposal of human and animal waste), উন্নত পরিবেশ (Improving living condition) এবং ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এ ধরনের অসুস্থতা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

চা উৎপাদন শ্রমিক রুলস'১৯৭৭-এ উল্লেখ আছে, যে সমস্ত বাগানে কমপক্ষে ৪০০ জন শ্রমিক রয়েছে অথবা যে সব বাগানের আয়তন প্রায় ৪০০ একর, সেই সমস্ত বাগান কর্তৃপক্ষ চা শ্রমিকদের জন্য সম্ভাব্য সকল ধরনের স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহ করবে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য হাসপাতাল বা কিনিক স্থাপন করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ করতে হবে। হাসপাতাল বা ক্লিনিকে সকল ধরনের ঔষধপত্র এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুব্যবস্থা রাখতে হবে। আবার যে সমস্ত বাগানের শ্রমিক সংখ্যা ৪০০ এর নিচে সেইসব বাগানে কমপক্ষে একজন কম্পাউন্ডার সহ একটি ডিসপেনসারি থাকতে হবে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কতকগুলো বাগান মিলেও একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। চা উৎপাদন শ্রমিক রুলস' ১৯৭৭-এর এ সমস্ত প্রভিশন চা বাগানগুলোতে চূড়ান্তভাবে লংঘন করা হয়েছে। গবেষণাভুক্ত বাগানগুলোর মধ্যে কোনটিতে কোন পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বাগানের হাসপাতালগুলো বিল্ডিং সর্বস্ব হয়ে পড়ে আছে। এগুলো থেকে তেমন কোন চিকিৎসা সুবিধা তারা পায় না। বাগানের নিয়োগকৃত খণ্ডকালীন ডাক্তার মাঝে মাঝে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো ঘুরে আসেন। সিলেট টি কোম্পানীর আওতাভুক্ত দুটি বাগানের শ্রমিকরা বাগানের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি হাসপাতাল (একই মালিকের প্রতিষ্ঠিত) থেকে চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, ৫২ শতাংশ নারী শ্রমিক স্থানীয় বিভিন্ন হাতুড়ে ডাক্তার ও কবিরাজের কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে এবং মাত্র ৩৩ শতাংশ নারী শ্রমিক বাগানের হাসপাতাল থেকে সেবা নিয়ে থাকে । তবে তাদের কেউই প্রাপ্ত সেবাতে সন্তুষ্ট নয়।

৫. কাজের সময়, পরিবেশ ও মজুরি বঞ্চনা

চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের কাজের সময় (Working Hour) অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। একজন চা শ্রমিক দৈনিক গড়ে ৮ ঘন্টা কাজ করে থাকেন। ঘাটতি মৌসুমে পাতা তোলার চাপ কম থাকলে শ্রমিকরা আরও কম শ্রমঘন্টা কাজ করেন। অধিকাংশ শ্রমিক সকাল ৯ টায় কাজে যোগ দিয়ে থাকে এবং বিকাল ৫ টা অবধি কাজ করে। তবে কোন কোন বাগানে সকাল ৮ টায়ও কাজে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে তাদেরকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। দুপুরের খাবারের জন্য তারা অল্প সময় বিরতি পেয়ে থাকে।

চা বাগানে নারী শ্রমিকদের প্রধান কাজ হলো চা পাতা উত্তোলন করা (Tea Plucking)। প্রতিজন নারী শ্রমিককে প্রতিদিন ২০-২৫ কেজি চা পাতা সংগ্রহ করতে হয়। চা পাতা উত্তোলন করা ছাড়াও তাদেরকে আরো বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। যেমন : গাছ কাটা, জঙ্গল পরিস্কার করা, বাবুদের বাসায় কাজ করা, ফ্যাক্টরীতে

কাজ করা, চারা গাছ রোপণ করা ইত্যাদি। চা বাগানে তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কখনও কখনও ওভারটাইমও করতে হয়। অবশ্য এজন্য তাদেরকে কেজি প্রতি ১ টাকা বেশি মজুরি দেয়া হয়। চা বাগানে তাদেরকে কঠোর অনুশাসনের মধ্যে কাজ করতে হয়। কখনও কাজে যেতে দেরী হলে বাগানের সর্দার গেট বন্ধ করে দেয় এবং সেদিনের মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া পোকা মাকড় এবং কীটনাশক দ্রব্যের ভয়তো আছেই। তবুও তাদেরকে অতি কম মজুরি দেয়া হয়ে থাকে। অনেক সময় তারা নির্ধারিত মজুরি প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত হয়।

দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে সপ্তাহান্তে চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একজন পুরুষ শ্রমিক সপ্তাহে গড়ে ১৮০ টাকা পেলেও একজন নারী শ্রমিক গড়ে ১৬০ টাকা পেয়ে থাকে। নারী শ্রমিকদের পরিবার পিছু মাসিক গড় আয় ১,৮৯৬ টাকা এবং মাথাপিছু আয় মাত্র ৩৩৯ টাকা (Paul-Majumder, 2001)। এই মজুরি একজন শ্রমিকের সার্বিক উন্নতির জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল। অবশ্য বাগান মালিকগণ মনে করেন এই মজুরি মোটেও অপ্রতুল নয়। যেহেতু চা শ্রমিকরা বেশ কিছু অ-মজুরি (Non-wage) সুবিধা পেয়ে থাকে যার মধ্যে রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধা, বিনামূল্যে আবাসন সুবিধা, পানি সুবিধা, চিকিৎসা সুবিধা, ছেলে মেয়েদের শিক্ষা সুবিধা, শিশুগৃহ ও স্বল্পমূল্যে রেশন সুবিধা। চা বাগানে কর্মরত শুধু মাত্র স্থায়ী চা শ্রমিকেরাই এ সকল অ-মজুরি সুবিধা পেয়ে থাকে। এসব সুবিধার বাজার মূল্য যোগ করার পরও একজন চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি এদেশের একজন কৃষি শ্রমিকের সমান হয় না। একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নারী শ্রমিকেরা মজুরী বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে। চা বাগানগুলো একটি সংরক্ষিত এলাকা এবং লেবার লাইনগুলো আধুনিক লোকালয় থেকে অনেক দূরে হওয়ায় নারী শ্রমিকেরা অন্য কোন কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারে না। নারীরা সাধারণত গৃহের অভ্যন্তরে হাঁস মুরগী পালন করে কিছু আয় করতে পারে। কিন্তু নারী শ্রমিকেরা বাগান এলাকায় এগুলো পালন করতে পারে না। ছাগল গরু পালন করার উপরও বাগান কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কারণ গরু ছাগলের স্পর্শ পেলে বাগানের কচি চা পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়। পর্যাপ্ত ক্রেতার অভাবে ক্ষুদ্র দোকান ব্যবসাও লাভজনক হয় না। বাগান মালিকরা এই সুযোগ গ্রহণ করে শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে থাকে।

সারণি-১০: নারী শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি (টাকা)

বাগানের ক্যাটাগরী	শ্রমিকের ধরন			
	পুরুষ	নারী	কিশোর কিশোরী	শিশু
'এ'	২৮	২৮	২৭.৩০	২৬.৭০
'বি'	২৭.৮০	২৭.৮০	২৭.১০	২৬.৫০
'সি'	২৭.৬০	২৭.৬০	২৬.৯০	২৬.৩০

উৎস: বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, ২০০২।

গবেষণায় দেখা গেছে প্রতি পরিবারে ২ জন সদস্য উপার্জনশীল এবং প্রতিজন চা শ্রমিকের আয়ের উপর প্রায় ৩ জন নির্ভরশীল ব্যক্তি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ১৫০-

১৮০ টাকা দিয়ে ৩ জনের পরিবারের ১ সপ্তাহের মান সম্পন্ন আহারের খরচ নির্বাহ করা বাস্তবিকই অসম্ভব। তবুও তারা বিকল্প কোন কাজের সুযোগ না পেয়ে বছরের পর বছর ধরে এই পেশায় শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। জরিপে দেখা গেছে ১ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত কাজ করছে ১৫ শতাংশ, ৫-১০ বছর পর্যন্ত কাজ করে আসছে ১৭ শতাংশ। ২৭ শতাংশ কাজ করছে ১০-১৫ বছর যাবত এবং ২৬ শতাংশ কাজ করছে ১৫-২০ বছর ধরে।

সারণি-১১: চা শিল্পের সাথে নিয়োজিত থাকার সময়

মেয়াদ	গণ সংখ্যা	শতকরা
০১-০৫ বছর পর্যন্ত	১৫	১৫
০৫-১০ বছর পর্যন্ত	১৭	১৭
১০-১৫ বছর পর্যন্ত	২৭	২৭
১৫-২০ বছর পর্যন্ত	২৬	২৬
২০-২৫ বছর পর্যন্ত	১০	১০
২৫-৩০ বছর পর্যন্ত	০৪	০৪
৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত	০১	০১
মোট	১০০	১০০

৬. সন্তান পালন, ছুটি ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা

Decent work অবস্থা অর্জনের অন্যতম একটি শর্ত হলো পারিবারিক জীবন এবং কর্ম জীবনের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন। নারী শ্রমিকদের সকল ক্ষেত্রে শ্রম দেয়ার পাশাপাশি সন্তান লালন পালন ও পরিচর্যাসহ সংসারের প্রায় সকল দায়িত্ব পালন করতে হয়। গবেষণায় দেখা যায় বর্তমানে নারীরা কর্মজীবী হলেও তাদের প্রতি গতানুগতিক দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি এবং পুরুষের সমান মর্যাদা তাদের দেয়া হয় না। বর্তমানেও কর্মজীবী নারীকে তার কর্মস্থল থেকে গৃহে ফিরলে রান্না করতে হয়, সন্তানদের দেখাশোনা করতে হয় এবং সংসারের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হয়। অর্থাৎ নারীকে ঘরে এবং বাইরে দুই জায়গাতেই কাজ করতে হয়। প্রত্যেক নারীকেই এই দ্বিগুণ কর্ম দিবসের বোঝা বহন করতে হয় (Reddy,1986)। চা বাগানে নারী শ্রমিকেরাও একইভাবে বাগানে কাজ করার সাথে সাথে পরিবারের দায়িত্বাবলীও পালন করে থাকে।

সন্তান লালন পালনসহ পরিবারের দায়িত্বাবলী সম্পাদনের জন্য ছুটির সুবিধা থাকা জরুরী। চা বাগানের নারী শ্রমিকেরা ১২ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ (Maternity leave) ১৪ দিন বিভিন্ন ধরনের উৎসব ছুটি ভোগ করে থাকে। তবে এ সকল ছুটি কেবল মাত্র স্থায়ী শ্রমিকেরা পেয়ে থাকে। চা শ্রমিকদের চাকরি মোটামুটি স্থায়ী। তাদেরকে যখন তখন ছাঁটাই করা হয় না। দীর্ঘ দিন ধরে তারা কাজ করতে পারে।

তাছাড়া চা শ্রমিকদের রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধা এবং আংশিকভাবে হলেও পেনশন সুবিধাও রয়েছে। চা উৎপাদন শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্ডিন্যান্স ১৯৫৯ অনুযায়ী প্রতিজন শ্রমিকের বেতনের ৬.২৫ অংশ প্রভিডেন্ট ফান্ড খাতে জমা রাখার নিয়ম রয়েছে এবং মালিক পক্ষও সেই পরিমাণ অর্থ শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড খাতে জমা রাখবেন। কিন্তু চা শ্রমিকদের আয় কম হওয়ার কারণে কোন স্ঞ্চয় নেই। গবেষণায় ৯৯ শতাংশ উত্তরদাতাই জানিয়েছে তাদের কোন সঞ্চয় নেই।

চা বাগান এলাকায় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম একেবারেই সীমিত। সে কারণে বিভিন্ন জরুরী মুহূর্তে, বিশেষ করে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালন, বিয়ে, রোগ ব্যাধির চিকিৎসা ইত্যাদি, প্রভিডেন্ট ফান্ড হতে অনেকে ঋণ নিয়ে থাকে। ফলে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কোন নিশ্চয়তা দেয় না। চা শ্রমিকরা অজ্ঞ ও অসচেতন হওয়ার কারণে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের খুব বেশি মাথা ব্যাথা নেই। কারণ চা বাগানের চাকুরি যেহেতু আছে সেহেতু তারা সেখানেই থাকতে পারবে। তবে শর্ত হলো পরিবারের যে কোন একজনকে চা বাগানে কাজ করতে হবে। একারণে লেবার লাইনের বাসাগুলো ধরে রাখার জন্য ছেলেমেয়েদেরকেও তারা এই পেশায় নিয়োজিত করে থাকে।

৭. অধিকার সচেতনতা ও শ্রম সংগঠন প্রতিষ্ঠা

শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক শ্রমিকের প্রাণের দাবী। যারা সারাদিন শ্রম দিয়ে তিলে তিলে একটি শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়া জরুরী। মালিকরা সব সময় কম মজুরি দিয়ে অধিক মুনাফা লাভের চেষ্টা করবে। চা শ্রমিকদেরকেই তাদের অধিকার আদায় করে নিতে হবে। কিন্তু চা শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। চা শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন আইন রয়েছে। যেমন, চা উৎপাদন শ্রমিক রুল্‌স ১৯৭৭, মাতৃত্বকল্যাণ আইন (চা বাগান)'১৯৫০, চা উৎপাদন শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্ডিন্যান্স' ১৯৫৯); কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে তাদের অধিকাংশই অবগত নয়। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের ৭০ শতাংশ এ বিষয়ে কোন কিছু জানে না।

শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য গঠন বা সংগঠন প্রতিষ্ঠা জরুরী। চা শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৮ সালে 'বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন' নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠে। গত কয়েক দশক ধরে চা শ্রমিকদের স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এ সংগঠনে প্রায় ৭০ হাজার সদস্য রয়েছে, যা মোট স্থায়ী শ্রমিকের প্রায় ৮৪ শতাংশ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো চা শ্রমিকদের অধিকাংশই বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক সংগঠন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না। বিশেষ করে নারী চা শ্রমিকদের অধিকাংশই এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। প্রতিমাসে তাদের বেতন থেকে নিয়মিত ৭-১০ টাকা হারে চাঁদা কর্তন করা হয়ে থাকে কিন্তু সে বিষয়েও তারা অবগত নয়। গবেষণায় দেখা যায়, ৭১ শতাংশ নারী শ্রমিক সংগঠনের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত কিন্তু শ্রমিক সংগঠনের কার্যাবলী সম্পর্কে তারা অজ্ঞ এবং বাকী ২৯ শতাংশ নারী শ্রমিক সংগঠন আছে এটাও জানেন না। চা শ্রমিক ইউনিয়ন-এর কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের সুযোগ তারা খুব কমই পেয়ে থাকে। কারণ কর্ম-

সময়ের পরে সাংসারিক কাজকর্ম (Household work) নিয়েই তাদেরকে ব্যস্ত থাকতে হয়।

নারী শ্রমিকদের সমস্যা

নারী চা শ্রমিকদের উপর পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে চা শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি সাধারণ চিত্র ফুটে উঠে যা নারী শ্রমিকদের দুরবস্থাকেই প্রতিফলিত করে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

(১) নারী শ্রমিকদের বেতন ও অন্যান্য অ-মজুরি সুবিধাদি একেবারেই অপ্রতুল যা দিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করা খুবই কঠিন ।

(২) চা শ্রমিকদের মধ্যে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া করানোর আগ্রহ একেবারেই কম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

(৩) চা শ্রমিক বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট রয়েছে। ফলে ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে ।

(৪) অল্প বয়সেই নারী শ্রমিকদের মধ্যে চা শিল্পের সাথে জড়িত হওয়ার প্রবণতা বেশি।

(৫) চা বাগান এলাকায় বাল্যবিবাহের প্রভাব লক্ষণীয়। ফলে অধিকাংশ নারী শ্রমিক রুগ্ণ ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী ।

(৬) নারী শ্রমিকদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে অনীহা লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে নারী শ্রমিকদের মধ্যে সন্তান জন্মদানের হার (Total Fertility rate) তুলনামূলকভাবে বেশি। অত্যন্ত সংগত কারণে এদের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হারও বেশি।

(৭) অজ্ঞ ও অশিক্ষিত হওয়ার কারণে চা শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। এক্ষেত্রে নারীরা বেশি পশ্চাৎপদ ।

(৮) নারীদেরকে সারাদিন বাগানে কাজ করার পর বাড়ীতে গিয়ে গৃহ অভ্যন্তরের কাজ সম্পাদন করতে হয়। নারী শ্রমিকদের কোন বিশ্রাম নেই। সারাদিন তারা কাজের মধ্যে নিয়োজিত থাকে। এতে তারা শারীরিকভাবে বেশ দুর্বল হয়ে থাকে। ফলে তাদের পরবর্তী বংশধররা (Next generation) ক্ষীণকায় ও দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকে ।

সুপারিশ

বাংলাদেশের চা শিল্প একটি পুরাতন শিল্প হলেও এই শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন তেমন একটা হয়নি। জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে এটি একটি সম্ভাবনাময় শিল্প হলেও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে আমরা সে সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারিনি। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবহেলা ও শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়েছে এই শিল্প। ফলে জাতীয় অর্থনীতির সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চা শিল্পের সাথে জড়িত

শ্রমিকরা। সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নারী শ্রমিকেরা। দীর্ঘদিনের শোষণ ও বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে সমাধান যোগ্য নয়। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার সঠিক বাস্তবায়ন। চা বাগানে কর্মরত নারী শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো :

(১) চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন অ-মজুরী সুবিধাদি বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন আবাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, ঋণ সুবিধাদি প্রদান ইত্যাদি।

(২) বাল্য বিবাহ ও বাল্য মাতৃত্ব রোধ করা। চা বাগান আইনগুলো সংশোধন করে বাল্য বিবাহ ও বাল্য মাতৃত্ব বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান সংযুক্ত করা।

(৩) চা শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ও শ্রমিকদের পক্ষে আলাপ আলোচনার জন্য একাধিক প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান বা শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া। এই শ্রমিক সংগঠনগুলো মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা

(৪) চা শ্রমিক ইউনিয়ন, মাদার্স ক্লাবসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা এবং এগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি চালুর ব্যবস্থা করা ।

(৫) শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। এ লক্ষ্যে প্রয়োজন বাগান এলাকায় বাগান কর্তৃপক্ষ ও সরকারের যৌথ উদ্যোগে সরকারি বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা এবং শিশুদেরকে শ্রমে নিয়োগ বন্ধ করে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য বিকল্প সুযোগ সুবিধা (Incentive) প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমনঃ উপবৃত্তি, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদি ।

(৬) নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জ্ঞান দান করার জন্য বাগান এলাকায় কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করতে হবে ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

(৭) বাগান এলাকায় কর্মজীবী মায়েদের ছোট সন্তানদের জন্য শিশুগৃহ স্থাপন করতে হবে। কারণ কর্মকালীন শিশু লালন পালনের সুবিধা কর্মের প্রতি মা-শ্রমিকের নিষ্ঠা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয় এবং কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা হ্রাস করে উৎপাদনশীলতা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে। তাই একটি চা বাগানে শিশু লালন পালনের ব্যবস্থা থাকা জরুরী। এনজিওগুলো মালিকদের সহযোগিতায় এই শিশু পালন ব্যবস্থা প্রদান করতে পারে ।

(৮) চা বাগানের ভিতরে লেবার লাইনে বিভিন্ন এনজিও ও উন্নয়ন সংগঠনগুলোর প্রবেশ নিশ্চিত করতে হবে। চা বাগান এলাকায় এ সকল উন্নয়ন সংগঠনগুলো নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসেবা, অধিকার সচেতনতা,

শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ।

(৯) চা শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড, কল্যাণ ভাতা, গ্র্যাচুইটি প্রবর্তনসহ বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা ।

(১০) কর্মজীবী মায়েদের যেহেতু চা বাগানে কাজ করার পাশাপাশি গৃহের কাজও করতে হয় এজন্য তাদের মোট কর্মসময় পুরুষের তুলনায় কম করার ব্যবস্থা করতে হবে। সাথে সাথে অবকাশ যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ছুটির ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

(১১) কর্মকালীন বিভিন্ন বিপদাপদে নারী শ্রমিকদের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন জরুরী ও বিশেষ মুহূর্তে আর্থিক সহায়তা দানের ব্যবস্থা করা। যেমন: বিয়ে, দুরারোগ্য কোন রোগব্যাধি ইত্যাদি।

(১২) কর্মজীবী মা ও শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত বিনোদনমূলক সুবিধা প্রবর্তন করা ।

(১৩) প্রচলিত শ্রম আইন বাস্তবায়ন ও চা শিল্পের বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।

(১৪) কর্মজীবী নারীদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহ দানসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনের নিরিখে প্রতি চা বাগানে এক বা একাধিক শ্রমকল্যাণ অফিসার (Labour welfare officer) নিয়োগ করা যেতে পারে ।

উপসংহার

বাংলাদেশের চা শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও দক্ষ শ্রমশক্তি বিনির্মাণের উপর। ভবিষ্যৎ দক্ষ শ্রমশক্তি বিনির্মাণে নারী শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা অপরিহার্য। নারীদেরকে যদি সুস্থ, সবল ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায় তাহলে ভবিষ্যতে দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এ জন্য চা শিল্পে ভবিষ্যৎ দক্ষ শ্রমশক্তির ঘাটতি নিরসনে নারী শ্রমিকদের উন্নয়নে সরকার, চা বাগান মালিক, শ্রমিক সংগঠন ও এনজিওগুলোকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। চা শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে যথাশীঘ্রই দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। চা শিল্প ও এর সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের সমস্যা দূরীকরণ সম্ভব হলে বাংলাদেশে চায়ের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য বিরাট একটি কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হবে -এ আশা করা যায় ।

তথ্য নির্দেশ

আলম, মাহবুবুল ও সুলতানা, সালমা (২০০৪), "চা শিল্পে নিয়োজিত শিশু ঃ একটি সমীক্ষা" (অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন), সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ।

ইসলাম, মাহবুব-উল এবং হোসেন, মনজুর, "চা', ক্যামেলিয়া এ্যাগ্রো ইনডাস্ট্রিয়াল সার্ভিসেস লিঃ, মগবাজার, ঢাকা, ১৯৯৪ ।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০০৪), অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

পাল মজুমদার ও মাহফুজুর রহমান সরকার, বাংলাদেশে চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ২০(১৪০৯), পৃ ৬৫-৯৩.

মোজাহার আলী (১৯৮৬), হাতে কলমে চা উৎপাদন, ক্যামেলিয়া প্রকাশন, ঢাকা ।

Bangladesh Labour Force Survey (2001-2002), Bagladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

Bangladesh Tea Board (2004), Project and Development Unit, Bangladesh, Moulvibazar.

International Tea Committee (ITC), Annual Bulletin of Statistics (1996), Sir John Lyon House, 5, High Timber Street London.

Pratima Paul Majumder(2001), Working Conditions in Bangladesh Tea plantation Industry & Socio-economic Status of Workers: role of social dialogue, A background paper prepared for the Sub-regional Meeting on Industrial Realtion Issues and Promotions of Social Dialogue in the Tea plantation sector in South Asia, BIDS, Dhaka.

Reddy. C., Raghunandha (1986), Changing Status of Educated Working Women: a case study, B.R. Publishing Company, India.

Saha, J.K. (2001), A study to asses the Socio-economic Status in the Context of Working Efficiency of Tea Workers in Bangladesh, Bangladesh Tea Industry and Agricultural Research Council.

Sana, D.L. (1989), Tea Science, Asrafia Boi Ghor, Banglabazar, Dhaka.

Sivaram, B. (1996). Productivity Improvement and Labour Relations in the Tea industry in South Asia, Working papers, Sectoral activities programme, ILO, Geneva.